শহর থেকে একটু দূরে বিক্রমপুরে

নিবিড় চৌধুরী

শুরুটা দুই পঙতি কবিতা দিয়েই করি, ‘যাওয়ার ছলে আমার হঠাৎ চলে গেলাম বিক্রমপুরে/ব্যস্ত নাম মানুষ আর রুগ্ন দিনের শহর থেকে দূরে।’ কবিতা আমাদের আদি সাহিত্য। আর ঠিক বাংলার আদি ও ঐতিহ্যগত স্থান বললে যে কয়েকটি নাম উঠে আসবে তার একটি বিক্রমপুর।

আজকের যেটা মুন্সিগঞ্জ, তার আদি নাম বিক্রমপুর। জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রী অতীশ দীপঙ্করের স্মৃতি আজও বুকে নিয়ে আছে এই শহর। আছে কী? নাকি কালের গহ্বরে হারিয়ে গেছে? জাতি হিসেবে আমরা এত অধম ও অসেচতন যে, ঐতিহ্যের কিছুই রক্ষণাবেক্ষণ করতে জানি না। অথচ একটি জাতির গৌরব ও আত্মপরিচয়ের মূল জায়গা হলো তার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। কিন্তু বাঙালি কেন যেন এসবের ধার ধারে না। বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক শিহযাদ ফিরদাউস তার ‘শাইলকের বাণিজ্যবিস্তার’ উপন্যাসে লিখেছিলেন, ‘ইতিহাস না থাকলে একটা জাতি অনাথ হয়ে যায়।’

সে যাই হোক। অনেকে বলবেন, জ্ঞান দিতে বসেছি। তা না হয় একটু দিলাম। টাকা তো খরচ হচ্ছে না! মুন্সিগঞ্জ এখন বিক্রমপুরকে ধারন করে কিনা জানি না। তবে প্রমত্ত পদ্মা ধারণ করে আছে এই শহরকে। মুন্সিগঞ্জ মানে এখন রাতের বেলা পদ্মার ইলিশ খেতে চট্টগ্রাম সড়কের উড়ালসেতু পেরিয়ে সাঁই সাঁই করে প্রাইভেট কার ও বাইকের রাগি হর্ন বাজিয়ে ছুটে চলা। মাওয়া সড়কে ইলিশের ব্যবসাটাও ভালো জমেছে। দল বেঁধে বন্ধুরা মিলে বিশাল ইলিশ সজ্জিত রেস্টুরেন্টে যাওয়া বা পাশে থরে থরে সাজানো হোটেলগুলোতে বসা, ঢাকা শহরের ব্যস্ত মানুষের একদিনের ছুটিতে ঘোরাঘুরির জন্য আর কী চাই! আমিও বাইকের পেছনে বসে ইলিশ খেতে রাতের বেলা ছুটে গিয়েছিলাম মুন্সিগঞ্জের মাওয়ায়। তবে বিক্রমপুরকে দেখতে হলে যেতে হবে দিনের বেলা। উদাস বিকেলে বসতে হবে পদ্মার পাড়ে। এক্ষণে স্মৃতি থেকে কবিতার আরও কয়েকছত্র পড়া যাক, ‘সবুজেরা সাঁই সাই সাঁই পালিয়ে যাচ্ছে সরে/দাঁড়াও পদ্মা আরেকটু পথ নৌকা নিয়ে তীরে।/আমরা বসবো তোমার পাড়ে নৌকা যেথায় বাঁধা/অলস দুপুর, ঝাঁ-ঝাঁ রোদে লাগবে মনে ধাঁধাঁ।’

প্রথমবার আমি মুন্সিগঞ্জ গিয়েছিলাম বছর চারেক আগে। লোকাল বাসে চড়ে। আমি আর প্রকাশক

সোহাগ (আহমেদ) ভাই। তার অফিস ফকিরাপুল। সেখান থেকে দুজনে গুলিস্তানে গিয়ে উঠে বসলাম মুন্সিগঞ্জগামী বাসে। সদরঘাট থেকে নৌপথেও মুন্সিগঞ্জে যাওয়া যায়। তবে সময়ের কারণে বেছে নিলাম, 'জার্নি বাই বাস'। টিকিটের মূল্য ৬০ টাকা করে নিলেও বাস ছাড়তে ছাড়তে আধঘণ্টা! গরমে যাত্রীদের হাঁসফাঁস অবস্থা। বাসে বিক্রি হচ্ছিল ঠান্ডা পানি ও আমড়া। আমরা কিছুই খেলাম না। অপেক্ষা করতে লাগলাম বাস ছাড়ার। যাত্রী বোঝাই বাস ছাড়ল। আর আমরা ঢাকাকে পেছনে রেখে ছুটে যাচ্ছি বিক্রমপুরে।

শুধ গুলিস্তান নয়, সায়েদাবাদ ও যাত্রাবাড়ী থেকে এই রুটে বিভিন্ন পরিবহনের অসংখ্য বাস প্রতি ১০/১৫ মিনিট পর পর চলাচল করে। ভাড়াও খুব বেশি নয়। একদিনের জন্য ভ্রমণপিপাসু কেউ একটু ঘুরতে চাইলে যেতে পারেন মুন্সিগঞ্জে। লোকাল বাসে সময় লাগবে ঘণ্টা দেড়েকের মতো।

বিক্রমপুর বললেই অতীশ দীপঙ্কর ছাড়া আরেকটি নাম মাথায় ঘুরপাক খায়, হুমায়ুন আজাদ। বাংলাদেশের অন্যতম সাহিত্যিক ও ভাষাবিজ্ঞানী। আঁড়িয়াল খাঁ নদের কথা প্রথম জানি তার লেখা পড়ে। বিক্রমপুরের এই সন্তান ছিলেন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রথাবিরোধী লেখক। অধ্যাপনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। হুমায়ুন আজাদ তার 'ভালো থেকো' কবিতায় আঁড়িয়াল নদের রূপ চিত্রিত করেছেন এভাবে, 'ভালো থেকো রোদ, মাঘের কোকিল/ভালো থেকো বা, আড়িয়ল বিল।' শ্রীনগরের সেই নদ এখন শুকিয়ে বিল। নদী দূষণ-শাসনের ফলে বাংলার ভূ-প্রকৃতি যে পাল্টে যাচ্ছে, তার প্রভাব পড়েছে আড়িয়লের ওপরেও। তারপরও এই বিলের মাছ স্বাদে ও মানে এখনো অনন্য। গ্রামের হাটে এখনও উঠে। আমাদের অবশ্য খাওয়া হলো না। শুধু দেখলাম বাজারে।

বাস থেকে নেমে আমরা এক অটোরিকশা নিয়ে চলে গেলাম মাওয়া। তখন দুপুর গড়িয়ে পড়ছে। ৩৫/২৬ কিমি রাস্তা পেরোতে আমাদের ঘণ্টা দুই গেছে বাসে। পেটে তখন ইঁদুর দৌড় শুরু হয়েছে। মাওয়া নেমে শুরুতেই চলে গেলাম এক হোটেলে। তখনও প্রজেক্ট হিলসা পুরোপুরি হয়নি। মাওয়াতেও এত হোটেল ছিল না। তারপরও কাস্টমার আনার জন্য হোটেলের লোকজনের সে কি ডাকাডাকি! কারও ডাক তো আর উপেক্ষা করতে পারি না! তার মধ্যে পেটে ক্ষুধার যুদ্ধ বেড়েই চলেছে। অত কিছু না ভেবে একটা হোটেলে ঢুকে পড়লাম। এলাম যখন পদ্মার বিখ্যাত ইলিশ না খেলে কি চলে! ইলিশ ভাজার সঙ্গে নিলাম ডাল, বেগুন ভাজিও। চেটেপুটে খাওয়ার পর লোকে লোকারণ্য হয়ে থাকা পদ্মার পাড়ে গেলাম। সারি সারি বাঁধা জাহাজ। কেউ যাচ্ছে, কেউ আসছে। হৈ-হুল্লোড়। একটু নিরিবিলির খোঁজে সেখান থেকে আস্তেধীরে চলে গেলাম বিক্রমপুরের গ্রাম ঘুরতে। ভ্রমণসঙ্গী সোহাগ ভাই তো আছেনই, যোগ হলেন এক রিকশাওয়ালাও। তিনিই ঘুরে ঘুরে দেখাবেন বিখ্যাত মুন্সীগঞ্জের গ্রাম, নদী, বাজার। গল্প করতে করতে তার সঙ্গেই চললাম। প্রথমে যে গ্রামে গেলাম, তার নাম তো এতদিন পরে ভুলেই গেছি। এমনিতেই আমার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। সেই গ্রামের পথ গেছে পদ্মার পাড় ঘেঁষে। ঘাটে নৌকা বাঁধা। মাঝিরা প্রমত্ত পদ্মায় মাঝ ধরতে ব্যস্ত। কেউ যাচ্ছে পদ্মার ওপাড়ে সারি সারি বাঁধা রিসোর্টে। বিশেষ করে কপোত কপোতীরা। ভরা নদী পাড়ি দিয়ে এভাবে ভ্রমণ অ্যাডভেঞ্চার বটেই। আমরাও বসলাম ঘাটে বাঁধা নৌকার এক গলুইয়ে। অতিদূরে দুটি বট গাছ। এক বংশীবাদক আপন মনে বাঁশি বাজিয়েই চলেছে। কয়েকজন শিশু খেলছে। সূর্যের আলোকিত রশ্মি পানিতে পড়ে চিকচিক করছে। এমন দৃশ্য দেখলে নির্ঘাত শিল্পী তুলিতে তাড়াতাড়ি রঙ মাখিয়ে ক্যানভাস নিয়ে বসে যেতেন। কিন্তু আমি তো শিল্পী নই! শুধু স্মৃতিটুকু মনে ধরে আছি, হারানো প্রেমিকার মতো। একটু রোদ পড়তেই আমরা গ্রামের ভাঙা রাস্তায় হাঁটতে লাগলাম। এক বটগাছের নিচে কয়েকজন মাছ বিক্রেতা, কয়েকজন সবজি বিক্রেতা। মনে হলো, ছোট হাট। যে পথ দিয়ে এসেছি, সেদিকে ফিরতেই দেখলাম, 'ভাগ্যকূল মিষ্টিভান্ডার'। মাছিদের মতো আমাদেরও সেদিকে যাত্রা এবার। বিক্রমপুরের মিষ্টির সুনাম শুধু মাছি ও মধুপোকাদের কাছে নয়; দেশজুড়েও আছে। হয়তো আমরা ভাগ্যকূল গ্রামেই গিয়েছিলাম।

বিক্রমপুরে গেলে অতি অবশ্যই পদ্মার পাড়ে বসবেনই, সঙ্গে মিষ্টিও খাবেন। গ্রামেগঞ্জে ঘুরবেন। নয়তো জানবেন কী করে! অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক বলেছিলেন, কোথাও গেলে সে অঞ্চলের মানুষ কী খায় ও কী পরে সেটি জানা প্রয়োজন। নয় তো সব অজানাই রয়ে যায়। বিক্রমপুরে গেলে অবশ্যই যাবেন সদর উপজেলার বজ্রযোগিনী গ্রামে, অতীশ দীপঙ্কর পণ্ডিতের ভিটায়। আরও যাবেন রাড়িখালে। এখানেই জন্মেছিলেন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু। তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন গাছেরও প্রাণ আছে। এই রাড়িখালে জন্মেছিলেন হুমায়ুন আজাদও।

প্রাচীন বাংলার প্রসিদ্ধ স্থান বিক্রমপুর। বৌদ্ধদের পরে এই স্থান ছিল হিন্দু অধ্যুষিত। আজকের মুন্সিগঞ্জ নামকরণের আগে এই অঞ্চল বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিকভাবে ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকা বিভাগের যে কয়টি জেলা, তার মধ্যে মুন্সিগঞ্জ বেশ এগিয়ে। পদ্মার পাড়ে হিলসা প্রজেক্ট, পদ্মা রিসোর্ট; এখন এই অঞ্চলের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ছুটিতে হোক বা ব্যস্ত চাকরি জীবনের একদিনের ডে অফে, পরিবার বা বন্ধুদের নিয়ে আপনারাও ঘুরে আসতে পারেন বিক্রমপুরে। ইতিহাসও দেখলেন, আধুনিক সভ্যতার কিছু নিদর্শনেরও স্বাদ পেলেন।